ছাত্ররাজনীতি বনাম ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্ব ও বিরাজনীতিকরণ

১৪ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৩ অক্টোবর ২০১৯ ২৩:৪৯

দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে ক্রিকেট স্টাম্প-লাঠি ইত্যাদির আঘাতে, সাপ পিটিয়ে মারার মতো করে, ‘স্যাডিস্টিক’ হিংস্রতায় বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারকে হত্যা করা হয়েছে। দেশবাসী আজ স্তম্ভিত, বেদনাহত ক্ষুব্ধ। তারা বুঝতে চাচ্ছেÑ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটতে পারার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো কীভাবে? কে তা সৃষ্টি করল? এর দায়ভার কার?

এসব বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে জবাব খোঁজার চেষ্টা না করে এর দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘ছাত্ররাজনীতি’র ওপর। এটি কি যুক্তিযুক্ত হচ্ছে? নাকি এর দ্বারা ‘সব দোষ নন্দ ঘোষের’ ওপর চাপিয়ে দিয়ে অন্য কোনো ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হচ্ছে?

একটি চিহ্নিত মহল ‘ছাত্ররাজনীতি’ নিষিদ্ধ করার দবি তুলেছে। ভিসির নেতৃত্বে বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের চোখের সামনে ফ্যাসিস্ট দখলদারদের বিনা বাধায় ‘টর্চার সেল’ চালাতে দিলেও তারা গত ১১ অক্টোবর নতুন করে ‘ছাত্ররাজনীতি’ নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। অথচ কে না জানে যে, বুয়েটে (এবং দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে) ‘ছাত্ররাজনীতি’ অনেক দিন ধরেই কার্যত নিষিদ্ধ রয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য বামপন্থি ও আদর্শবাদী সংগঠনকে কোথাও কাজ করতে দেওয়া হয় না। প্রায় সর্বত্রই ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনের দুর্বৃত্তমূলক একচ্ছত্র ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে। প্রশ্ন হলোÑ যেখানে ‘ছাত্ররাজনীতি’কে এভাবে একরকম ‘নিষিদ্ধ’ করে রেখে ‘দুর্বৃত্ত-রাজত্ব’ চলছে, সেখানে আবরার হত্যাকা-ের জন্য ‘ছাত্ররাজনীতি’কে দায়ী করার বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি? অথচ এই বিশেষ মহলটি তাদের পুরনো ও ‘বিরাজনীতিকরণের’ ফর্মুলা এই সুযোগে আবার সামনে আনার চেষ্টা করছে। এ রকম প্রচারণা চালিয়ে ইতিপূর্বে এ দেশে ওয়ান-ইলেভেন, সামরিক শাসন ইত্যাদি চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের কথা দেশবাসীর জানা আছে।

advertisement

এ কথা স্পষ্ট যে, ছাত্ররাজনীতি ‘থাকার’ কারণে নয়, বরং তা ‘না থাকার’ কারণেই আবরার হত্যাকা-ের মতো ঘটনা ঘটতে পেরেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট দখলদাররা দিনের পর দিন ‘টর্চার চেম্বার’গুলোয় নির্যাতন চালাতে পেরেছে। সুস্থধারার ‘ছাত্ররাজনীতি’ এসব দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি। তাই ‘ছাত্ররাজনীতি’ সব সময় হয়ে থেকেছে বুর্জোয়া শাসক-শোষকদের একটি প্রধান টার্গেট। এর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের অস্ত্র হলো ‘দুর্বৃত্তায়িত ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্ব’। অন্যদিকে সুশীল সমাজ বলে দাবিদার বিশেষ মহলটি আক্রমণ হানছে ‘ছাত্ররাজনীতি’ নিষিদ্ধ করার ‘বিরাজনীতিকরণের’ অস্ত্র দিয়ে।

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের এই প্রস্তাবনার ভালো কাটতি থাকার কারণ আছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ‘ছাত্ররাজনীতি’র নামে খোলামেলাভাবে চলছে কুৎসিত দলবাজি, চর দখলের কায়দায় দখলদারি, সন্ত্রাসী-মাস্তানি, ক্যাডার বাহিনীর নামে দুর্বৃত্ত লালন, ক্রিমিনালদের আশ্রয়দান, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পার্সেন্টেজ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, তদবির বাণিজ্য ইত্যাদি। রাষ্ট্রক্ষমতার ও রাজনীতির ‘প্রটেকশন’ পাওয়ার জন্য এসব কাজের সঙ্গে নেতা-নেত্রী ভজন, দলীয় সেøাগানের জজবা ওঠানো, জোরজবরদস্তি করে অথবা নানা সুবিধার উচ্ছিষ্ট বিতরণ করে হল-হোস্টেল ও পাড়ামহল্লার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দলীয় শোডাউন করা, মুরুব্বি দলের ‘বড়ভাই’দের পক্ষ হয়ে উপদলীয় তৎপরতায় শক্তি জোগানো, দল-উপদলের প্রয়োজনে পেশিশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি যুক্ত করা হচ্ছে।

ভ্রষ্ট ‘ছাত্রনেতা’ নামধারীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিণত করছে কোটি কোটি টাকার অবৈধ উপার্জনের একটি স্বতন্ত্র উৎসে। কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে কমিশন খাওয়া, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য, অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদান (ংধহপঃঁধৎু ভড়ৎ পৎরসরহধষং), হাইজ্যাকার-দলকে লালন, তদবির বাণিজ্যÑ কোনো অপরাধমূলক দুষ্কর্মই বাদ থাকছে না। এসব থেকে কামাই হচ্ছে কোটি কোটি টাকার লুটের মাল। সেই লুটের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অনেক সময়ই সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। কখনো দুই দলের মধ্যে। কখনো আবার একই দলের দুই বা অধিক গ্রুপের মধ্যে। তা থেকে শুরু হচ্ছে গোলাগুলি, সংঘাত, সংঘর্ষ।

প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রটিও এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। একসময় বুর্জোয়া ধারার সংগঠনকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো ছাত্র ইউনিয়নের মতো বামপন্থি ও আদর্শবাদী সংগঠনের সঙ্গে। তখন প্রতিযোগিতা হতো আদর্শবাদিতা ও দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চেতনা ও উন্নত সাংস্কৃতিক-মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। সুন্দরের কম্পিটিশনে টিকে থাকার জন্য তাদেরও সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করতে হতো। পর্যায়ক্রমিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে পারার সুযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এখন গায়ের জোরে 'বড় দল' হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অনুসারী ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। এদের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে নেতা-নেত্রী ভজন, অপরাধমূলক দুষ্কর্ম পরিচালনা, মাস্তান বাহিনী লালন ইত্যাদি। 'স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগ সংক্রামক'। ফলে ক্রমাগতভাবে অধঃপতনের মাত্রা বেড়ে চলেছে। উভয় সংগঠনই আজ এভাবে দুষ্কর্মের ফাঁদে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ছাত্রশিবিরের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। হত্যা, খুন, জবাই, রগ কাটা, হাত-পা ছেদন, হামলা, অগ্নিসংযোগÑ হেন দুষ্কর্ম নেই, যাতে তারা লিপ্ত নয়।

ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির প্রভৃতি সংগঠন এখন গায়ের জোরে 'ছাত্ররাজনীতি'র কৃত্রিম 'রাজা' হয়ে বসেছে। তারাই এখন 'ছাত্ররাজনীতি'র বাহক হিসেবে দৃশ্যমান। কিন্তু তারা যেসব বীভৎস কা-কারখানা ঘটিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে 'ছাত্ররাজনীতি'র কোনো সম্পর্কই আসলে নেই। সেসব কর্মকা- হলো নিছক লুটপাট ও দুর্বৃত্তমূলক অপরাধী কার্যকলাপ। বিজ্ঞানে যেমন 'ম্যাটার'-এর বিপরীত ধর্মী 'অ্যান্টি-ম্যাটার' রয়েছে, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সাম্প্রতিক প্রধান কাজকর্মের ধারাকে অনুরূপভাবে 'ছাত্ররাজনীতি'র বদলে 'অ্যান্টি ছাত্ররাজনীতি' বলে আখ্যায়িত ও বিবেচনা করাটিই যুক্তিযুক্ত। অথচ যাদের সঙ্গে 'ছাত্ররাজনীতি', ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রসমাজের মোটেও কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই, তারাই এখন 'ছাত্ররাজনীতি'র ভুয়া কর্ণধার এবং প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় দৃশ্যমান প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে। এসব ঘৃণ্য অপকর্মকে বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সহজ সমাধান হিসেবে 'ছাত্ররাজনীতি' নিষিদ্ধ করার কথাটি অনেক সাধারণ মানুষের মনেও উদয় হচ্ছে।

'ছাত্ররাজনীতি'র অদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? তার প্রকৃত স্বরূপই বা তা হলে কী? ছাত্ররা সমাজেরই একটি অংশ। ছাত্রসমাজের আছে সাধারণ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার বিষয়। এসব বিষয়কে অবলম্বন করেই ছাত্রদের নিজস্ব আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজন। ক্লাসরুমের ভাঙা বেঞ্চ-ব্ল্যাকবোর্ড মেরামত, বই-কাগজ-কলমের দাম কমানো, পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়সহ গণমুখী প্রগতিশীল শিক্ষানীতি, শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রভৃতি ছাত্রসমাজের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে ছাত্রসমাজের একতা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠবেÑ এটিই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

এসব ছাড়াও ছাত্রসমাজের পরোক্ষ (অথবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রত্যক্ষ) নানা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ও আছে। যেমন পড়াশোনায় পূর্ণ মনোনিবেশের স্বার্থে এবং গরিব বন্ধুকে অব্যাহতভাবে সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার স্বার্থে সমাজকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করা, জ্ঞান অš¦ষণের জন্য মুক্তচিন্তার পরিবেশ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়। তা ছাড়া শুধু বইয়ের পোকা হয়ে থাকাই নয়, প্রকৃত দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, মননশীলতা ও সৃজনশীল প্রতিভার জাগরণ ঘটিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেশ ও মানবসভ্যতা নির্মাণের কারিগর রূপে গড়ে তোলাই যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, সে কথাও মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। তাই গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, শোষণমুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান, দেশপ্রেম, উদার মানবিকতা, প্রগতিমুখিনতা, বিজ্ঞানমনস্কতাÑ ইত্যাদি বিষয়গুলোও ছাত্রসমাজের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। এসব বিষয়ের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকারি নীতি ইত্যাদি জড়িত। ছাত্রসমাজের শিক্ষাজীবনের নানাবিধ মৌলিক চাহিদাই এসব বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রসমাজকে সরাসরি সম্পৃক্ত করে তোলে। এগুলোই ছাত্রসমাজের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ও স্বাভাবিকভাবে উত্থিত 'রাজনীতির' বিষয়।

যারা 'ছাত্ররাজনীতি' বন্ধ করার কথা বলছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন হলোÑ ছাত্রসমাজের কি দেশপ্রেমিক হওয়া অত্যাবশ্যক নয়? এবং দেশপ্রেম কি রাজনীতি নয়? তা হলে ছাত্রসমাজকে 'রাজনীতিমুক্ত' করার চেষ্টা করা হলে তা কি তাদের দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টির প্রবণতার জন্ম দেবে না? এবং সেটিই কি 'ব্যক্তিস্বার্থ-অন্ধ দুর্বৃত্তায়িত লালসা ও দানবীয় প্রবণতা' বিস্তারের সুযোগ করে দেবে না? বুয়েটের ভিসি কি সেটিই করতে চান?

ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন ঘৃণ্য অপরাধমূলক অপতৎপরতা চলছে। সে কারণে 'ছাত্ররাজনীতি' নিষিদ্ধ করা উচিত বলে অনেক বলছেন। এ যুক্তি হলো অনেকটা মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার প্রেসক্রিপশনের মতো ব্যাপার। জাতীয় রাজনীতিতে আরও বড় ও ঘৃণ্য অপরাধ অপকর্ম চলছে। ভিসিসহ বুয়েট কর্তৃপক্ষ কি তা হলে একই যুক্তিতে এ দেশে 'রাজনীতি' নিষিদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করতে চান?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রসমাজের ‘রাজনীতি’ করার অধিকার তার স্বার্থ আদায়ের প্রশ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ‘রাজনীতি’ করা আর দলীয় লেজুড়বৃত্তি বা ‘দলবাজি’ করা দুটো এক জিনিস নয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। তাই একদিকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি বা ‘দলবাজি’ করা (যা বর্তমানে চরম রুগ্ণতা ও অধঃপতনের উৎস হয়ে উঠেছে) বন্ধ করা উচিত। কিন্তু পক্ষান্তরে সমান্তরালভাবে তাদের ‘রাজনীতি’তে (যা অতীতের ঐতিহ্যের ধারায় তাদের দেশপ্রেম ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে) উৎসাহিত করা উচিত।

‘ছাত্ররাজনীতি’র প্রকৃত ও সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনতে হলে বিশেষভাবে প্রয়োজন হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে ছাত্র সংসদের কার্যকলাপ পরিচালনার ধারা ফিরিয়ে আনা। ছাত্র সংসদের মাধ্যমে যেসব কাজ হওয়া সম্ভব, সেগুলো প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা লাভ এবং মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রশিক্ষণের জন্য অপরিহার্য। তাই সেগুলো শিক্ষা কার্যক্রমেরই একটি আবশ্যিক উপাদান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেমন একাডেমিক ক্যালেন্ডার থাকে এবং যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানসহ তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক, তেমনি সংসদ নির্বাচনের কাজটিও বার্ষিক ক্যালেন্ডারের বিষয়বস্তু করা বাঞ্ছনীয়।

ছাত্ররা বয়সে তরুণ। ছাত্র বয়সের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তার প্রদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে তা ‘সুস্থ’ অথবা ‘রুগ্ণ’Ñ এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি পথে ঘটতে পারে। ‘রাজনীতি’র দরজা অবধারিত রাখতে পারলেই সুস্থধারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রদর্শনের পথ তৈরি করা যাবে। সেই পথ রুদ্ধ করলেই আবির্ভাব ঘটবে অনাচার ও অপরাধমূলক প্রবণতার। কেবল শুদ্ধ ‘রাজনীতি’র প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারলেই সম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান কলুষতা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা। সে কারণেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আজ যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো আরও কম ‘রাজনীতি’ নয়, বরং আরও বেশি ‘রাজনীতি’।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আজ জোর করে জবরদখল করে রেখেছে ‘ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের দুর্বৃত্ত শক্তি’। এই অপশক্তির অবসান ঘটাতে পারে কেবল সুস্থ, সবল প্রগতিশীলধারার ছাত্র আন্দোলন ও ‘ছাত্ররাজনীতি’। আর ছাত্রসমাজই হতে পারে তার স্থপতি। এসবের বিরুদ্ধে তারা মাঝে মাঝে গর্জে উঠেছে প্রতিবাদে ঠিকই। কিন্তু তা অব্যাহত প্রতিরোধের রূপ নিতে পারেনি। সে জন্য প্রয়োজন সুস্থধারার ‘ছাত্ররাজনীতি’ ও ‘ছাত্র সংগঠনের’ স্থায়ী ও ধারাবাহিক উপস্থিতি। অথচ সে সুযোগটি কেড়ে নিতে এই ‘দুর্বৃত্ত ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের’ শক্তির অভিযানের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ‘বিরাজনীতিকরণের’ ভিন্ন লেবাসে সুশীল সমাজ বলে পরিচয়দানকারী মহলবিশেষের ‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার’ দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা।

এমতাবস্থায় তাই আজ চিৎকার করে বলতে হবে ‘ছাত্ররাজনীতিÑ জিন্দাবাদ!’

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি